BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03050034

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 05| May 2025| e-ISSN: 2584-1890

একবিংশ শতাব্দীতে ভারত-চীন সম্পর্কের গতিশীলতা : ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনশীলতা এবং দ্বন্দ্ব

সঞ্জয় প্রামানিক

ছাত্র-গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Email: sanjoysagar1996@gmail.com

সারসংক্ষেপ (Abstract):

এই গবেষণাপত্রটি ভারত-চীন সম্পর্কের বিবর্তন বিশ্লেষণ করে, যা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কূটনৈতিক স্বীকৃতি থেকে শুরু করে বর্তমানের একটি "নতুন স্বাভাবিক" (new normal) অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, যা সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতা উভয়ের দ্বারাই সংজ্ঞায়িত। উক্ত গবেষণাপত্রে দেখানো হয়েছে ভারত-চীন সম্পর্কের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপগুলি মূলত অপরিবর্তনীয় ভূগোল এবং ঔপনিবেশিক ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা বিশেষভাবে আলোকপাত করে যে কীভাবে ম্যাকমোহন লাইনের মতো ব্রিটিশ আমলের বিতর্কিত সীমানাগুলি চলমান সামরিক সংঘাতকে উস্কে দিচ্ছে। এছাড়া এখানে আলোচনা করা হয়েছে আঞ্চলিক বিবাদের ঊর্ধ্বে উঠে এশিয়ায় নেতৃত্বের জন্য ভূ-রাজনৈতিক সংগ্রামের ওপর জোর দেওয়া। যেখানে ভারতের আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারকে প্রতিরোধ (contain) করতে চীন "গ্রে জোন" (grey zone) কৌশল ব্যবহার করে। এই উত্তেজনা সত্ত্বেও, শক্তিশালী বাণিজ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বৈশ্বিক ফোরামগুলিতে অভিন্ন স্বার্থের মাধ্যমে দুই দেশ গভীরভাবে যুক্ত রয়েছে। পরিশেষে, উভয় দেশের সম্পর্কটিকে কেবল একটি সাধারণ সংঘাত হিসেবে নয়, বরং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন এবং পারস্পরিক নির্ভরতার একটি বহুমুখী গতিশীলতা সম্পর্ক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এই গবেষণা পত্রে।

মূল শব্দ (Key Word): *বিবাদ এবং দ্বন্দ্ব, জিরো-সাম গেম, নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রতিযোগিতা, ভারত-চীন, সহযোগিতা, সালামি ট্যাকটিকস, Quad, BRI.*

মূল আলোচনা:

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত এশিয়ার দুই বৃহৎ শক্তি ভারত এবং চীনের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মেরুকরণ হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৫০ সালে সমাজতান্ত্রিক ব্লকের বাইরে প্রথম দেশ হিসেবে ভারতের গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে (PRC) স্বীকৃতি প্রদান থেকে শুরু করে বর্তমানের লাদাখ সীমান্ত উত্তেজনা পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথচলায় সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের এক অদ্ভুত সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারত ও চীনের এই বৈচিত্র্যময় সম্পর্কটি কেবল সীমান্ত বিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি ভূ-কৌশলগত আধিপত্য, অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থানের ক্রমাগত পুনর্নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া। বিশেষ করে ২০২০ সালের গালওয়ান উপত্যকার সংঘাতের পর থেকে এই সম্পর্ক একটি 'নতুন স্বাভাবিক' (New Normal) অবস্থায় প্রবেশ করেছে, যেখানে সীমান্ত স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের মধ্যে এক কঠিন দোদুল্যমানতা তৈরি হয়েছে।

ভারত–চীন সম্পর্কের আলোচনায় প্রায়ই একটি নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তা মূলত জিরো-সাম গেম ধারণার প্রভাব। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধরে নেয় যে, এক রাষ্ট্রের ধ্বংসে মধ্য দিয়ে অপর রাষ্ট্রের উত্থান অর্থাৎ দুই রাষ্ট্র সমানভাবে সহাবস্থান করতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে ভারত–চীন সম্পর্ককে জিরো-সাম হিসেবে ব্যাখ্যা করা তাত্ত্বিক ও বাস্তব—উভয় দিক থেকেই অসম্পূর্ণ। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বে লিবারাল ইনস্টিটিউশনালিজম ও কমপ্লেক্স ইন্টারডিপেনডেন্স দেখায় যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা, বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ একযোগে লাভবান হতে পারে (Keohane & Nye, 1977)। অতএব, ভারত–চীন সম্পর্ককে কেবল দ্বন্দ্বের বাইনারিতে না দেখে 4C দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি—

১. বিবাদ এবং দ্বন্দ্ব (contention and conflict)

২. নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রতিযোগিতা (containment or competition)

৩. সহযোগিতা (Cooperation) (Ghosh, 2018),

তাহলে দুটি দেশের সম্পর্ক জিরো-সাম গেম নয়। একে অপরকে নির্মূল করার গল্পই নেই। কারণ প্রতিবেশী হিসেবে অপর প্রতিবেশীকে নিঃশেষ করতে পারবো না। আর তা আধুনিক যুগে সম্ভবই নয়। আর প্রাচীনকাল থেকে ভারতের সাথে চীনের একটা সম্পর্ক ছিল। এবার এই চারটি সি এর মধ্যে কোথাও ধারাবাহিকতার কিছু কিছু সূত্র পাব আবার কোথাও কোথাও পরিবর্তন এসেছে। আমূল পরিবর্তন বিদেশনীতিতে সাধারণত লক্ষ্য করা যায় না। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিদেশনীতির কৌশল, কূটনীতি পাল্টাতে পারে।

ভারত–চীন সম্পর্ককে অনেকাংশে "victim of geography and history" হিসেবে বোঝা যায়। কারণ ভূগোল ও ইতিহাস—এই দুই চলক এমন কাঠামোগত বাস্তবতা তৈরি করেছে, যা রাষ্ট্রদ্বয়ের ইচ্ছা বা নীতিগত সিদ্ধান্তের বাইরে অবস্থান করে (Kaplan, 2012)। ভারত ও চীন একই বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত এবং দীর্ঘ সীমান্ত ভাগ করে নেয়, দৈর্ঘ্যে যা ৩,৪৮৮ কিলোমিটার। ভারতের হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, সিকিম, অরুনাচল প্রদেশ ও লাদাখ (পূর্ব জম্মু ও কাশ্মীর) সংলগ্ন অঞ্চলের চীনের সীমান্তের উপস্থিতি। যার ফলে পারস্পরিক নিরাপত্তা উদ্বেগ অনিবার্যভাবে জন্ম নিয়েছে (Haque, 2020)। এই ভূগোল পরিবর্তনযোগ্য নয়; ফলে সংঘাতের সম্ভাবনাও কাঠামোগতভাবে রয়ে যায়। একই সঙ্গে ইতিহাসকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। উপনিবেশিক সময়ে কৃত্রিম সীমারেখা ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সীমান্ত সমস্যা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে দ্বন্দ্বকে তীব্র করেছে। অতএব, ভারত–চীন সম্পর্কের সংঘাত কেবল নীতিনির্ধারকদের পছন্দের ফল নয়; বরং অপরিবর্তনীয় ভূগোল ও ইতিহাসের যৌথ চাপের ফল।

আধুনিক ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই সম্পর্ককে বিশেষভাবে ব্রিটিশ শাসনামলে দক্ষিণ এশিয়ায় আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সীমানা নির্ধারণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, তা ভারত–চীন দ্বন্দ্বের ভিত্তি নির্মাণ করে। বিশেষত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত জনসনলাইন (১৮৬৫) ও ম্যাকমোহন লাইন (১৮৯৩) সীমান্ত প্রশ্নকে জটিল করে তোলে। এই সীমারেখাগুলি স্থানীয় ঐতিহাসিক বাস্তবতা বা চীনের সম্মতির ভিত্তিতে নয়, বরং উপনিবেশিক প্রশাসনিক প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছিল। ফলে স্বাধীনতার পর ভারত ও চীন উভয়ই একই ভূখণ্ডকে নিজেদের সার্বভৌম অংশ হিসেবে দাবি করতে শুরু করে।এই অর্থে, ভারত–চীন সংঘাত কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং তা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, উপনিবেশিক সীমান্তনীতি এবং অপরিবর্তনীয় ভৌগোলিক বাস্তবতার যৌথ ফলাফল।

ব্রিটিশদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ছিল একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপনিবেশ, কারণ এখানকার বিপুল সম্পদ, রসদ ও কৌশলগত অবস্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি শক্ত করেছিল। এই মূল্যবান উপনিবেশকে রক্ষা করার জন্যই ব্রিটিশ নীতিনির্ধারকেরা frontier বা সীমান্ত অঞ্চলের ধারণা বিকাশ করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতের চারপাশে একটি প্রতিরক্ষামূলক buffer zone বা 'বেষ্টনী' নির্মাণ করা, যা রুশ বা চীনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অগ্রগতি রোধ করবে। ফলে সীমান্ত নির্ধারণ নিরাপত্তা-কেন্দ্রিক হলেও তা উপনিবেশিক স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত ছিল (Lamb, 1964)।

১৯৫০ সালের পর দক্ষিণ এশিয়ায় frontier ধারণা থেকে হঠাৎ করে border বা নির্দিষ্ট সার্বভৌম সীমার ধারণায় রূপান্তর ঘটে, যা মূলত দেশভাগ ও উপনিবেশিক শাসনের অবসানের ফল। ব্রিটিশ আমলে ভারতের উত্তর সীমান্তকে একটি অস্পষ্ট buffer frontier হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল, যেখানে তিব্বতকে একটি দুর্গম ও কার্যকর প্রতিরক্ষাবলয় হিসেবে ধরা হতো। কিন্তু ১৯৫০ সালে চীন তিব্বত দখল করার পর এই ভূরাজনৈতিক ধারণা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ভারত এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে কার্যত অনিবার্য বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ভারত ও চীনের সীমান্ত তিনটি অংশে বিভক্ত:পশ্চিম অংশের আকসাই চীনকে ভারত জম্মু ও কাশ্মীরের অংশ অপরদিকে চীন জিনজিয়াং প্রদেশের অংশ মনে করে। পূর্ব-প্রান্তেও ভুটানের পূর্বসীমা থেকে তিব্বত, ভারত ও মায়ানমারের ত্রিসংযোগে তালু পাশের কাছে একটি বিন্দু পর্যন্ত, এই সীমান্ত রেখাটি ম্যাগমোহন লাইন নামে পরিচিত। চীন ম্যাকমোহন লাইনকে অবৈধ বলে দাবি করে। মধ্যবর্তী অংশ, যা লাদাখ থেকে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অংশে তিব্বতের সাথে হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখন্ড সংযুক্ত। যেহেতু উপনিবেশিক সীমান্ত নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় চীনের কোনো কার্যকর অংশগ্রহণ ছিল না। ফলে চীন এই সীমান্তগুলোকে উপনিবেশিক অবিচারের ফল হিসেবে দেখে, অন্যদিকে ভারত ব্রিটিশ আমলে নির্ধারিত সীমার ধারাবাহিকতাকে বৈধ বলে মনে করে। এই ভিন্ন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিই সীমান্ত দ্বন্দ্বকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে (Haque, 2023)

এর ফলস্বরূপ, তাওয়াং, অরুণাচল প্রদেশ ও লাদাখের মতো অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব নিয়ে পরস্পরবিরোধী দাবি অব্যাহত রয়েছে। প্রতিনিয়ত চীনা অনুপ্রবেশের ফলে সীমান্তে হাতাহাতি এবং পাথর ছোঁড়ার ঘটনা ঘটছে।এই সীমান্ত সংকট সময়ে সময়ে তীব্র confrontation-এ রূপ নেয়, যার সাম্প্রতিক প্রকাশ ১৯২০ সালের জুন মাসে গালওয়ান উপত্যকায় সামরিক সংঘর্ষে দুই পক্ষের বেশ কিছু জওয়ান নিহত হন (Bhattacharya & Majumdar, 2022) ফলে বলা যায়, ভারত–চীন সীমান্ত সমস্যা একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্যেই মাঝে মাঝে বিস্ফোরক রূপ ধারণ করছে।এর সাথে আর দুটি ফ্যাক্টর হল - **প্রথমত:** চীনের কৌশলগত চিন্তাধারায় দীর্ঘদিন ধরে একটি সুসংহত বিশ্বাস কাজ করে এসেছে যে তারা ভারতের তুলনায় সামরিক ও সামগ্রিক ক্ষমতার দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী এবং প্রয়োজনে ভারতকে সামরিকভাবে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম। এই ক্ষমতাগত আত্মধারণার বাস্তব প্রতিফলন স্পষ্টভাবে দেখা যায় ১৯৬২ সালের সীমান্ত যুদ্ধে, যেখানে চীনা নেতৃত্বের ধারণা ছিল যে ভারত সামরিকভাবে অপর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত এবং দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ পরিচালনার সক্ষমতা তার নেই। ১৯৬২ সালের অভিজ্ঞতা চীনের কাছে কেবল একটি সামরিক সাফল্য নয়, বরং ভারতের উপর কৌশলগত ও মনস্তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার একটি দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে, যা পরবর্তী দশকগুলিতে চীনা নীতিনির্ধারক দের চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে রয়ে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে চীনের নিরাপত্তা ভাবনায় ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে সুস্পষ্ট অবরুদ্ধ রাখার মানসিকতা লক্ষ করা যায়.(Ghosh, 2018)। চীন বরাবরই ভারতের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, তিব্বত প্রশ্নে ভারতের সংবেদনশীলতা এবং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনাকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখেছে। ফলে ১৯৬২ সালের পর থেকে চীন এমন একটি নীতি অনুসরণ করে এসেছে, যার মাধ্যমে ভারত সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে সীমান্ত ও কৌশলগত পরিসরে নিয়ন্ত্রিত চাপের মধ্যে রাখা যায়।এই অবরুদ্ধ রাখার মানসিকতা আনুষ্ঠানিক নীতির আকার না নিলেও বাস্তব কৌশলগত আচরণে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-চীন সীমান্তে যে ধরনের সংঘর্ষ দেখা যাচ্ছে—দুই পক্ষের সেনার মুখোমুখি হওয়া, শারীরিক সংঘাতে জড়ানো, কিন্তু পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে রূপ না নেওয়া—তা চীনের **গ্রে জোন ট্যাকটিক্স**-এর সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রে জোন কৌশল সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক ক্ষমতার পার্থক্য বিদ্যমান এবং বৃহত্তর শক্তি সরাসরি যুদ্ধ এড়িয়ে সীমিত, ধাপে ধাপে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে কৌশলগত লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। চীনের ক্ষেত্রে এই কৌশলের উদ্দেশ্য হলো সীমান্তে ধীরে ধীরে বাস্তবতা বদলানো, কিন্তু এমনভাবে যাতে তা বৃহৎ যুদ্ধের দিকে গড়িয়ে না যায়।

এই আচরণের পেছনে একটি মৌলিক যুক্তি কাজ করে—চীন মনে করে যে প্রতিটি কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ অপরিহার্য নয়। বরং অসম শক্তি কাঠামোর বাস্তবতায় ছোট ছোট সংঘর্ষ, নিয়ন্ত্রিত উত্তেজনা এবং ধারাবাহিক সামরিক উপস্থিতির মাধ্যমেই ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব। এইভাবে চীন নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রেখে যুদ্ধ ছাড়াই কৌশলগত

সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়। ১৯৬২ সালের পর দীর্ঘ সময় ধরে এই ন্যারেটিভটি কার্যত অপরিবর্তিত থেকেছে এবং আজকের সীমান্ত সংঘর্ষগুলিও সেই ধারাবাহিক চিন্তাধারারই সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয়ত: আধুনিক ভারতের জন্মের পর থেকেই, বিশেষত জওহরলাল নেহেরু-র নেতৃত্বে, ভারত এশিয়ার মধ্যে অন্তত একটি নেতৃত্বদানকারী রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে এসেছে। এই প্রবণতা কেবলমাত্র তৎকালীন দুই মহাশক্তি ধর রাষ্ট্রের(সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং আদর্শগত স্তরেও তা প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান ঘটে—একটি গণতান্ত্রিক এবং অপরটি সমাজতান্ত্রিক। এই দুই ব্যবস্থার অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহই এশিয়ার মধ্যে নিজেদের একটি "পূর্ণাঙ্গ" ও বৈধ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে (Acharya, 2007)।

এই প্রেক্ষাপটে ভারত ও চীন উভয় রাষ্ট্রই এশীয় নেতৃত্বের প্রশ্নে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়। ভারতের ক্ষেত্রে এই নেতৃত্বের ধারণা গণতান্ত্রিক আদর্শ, নৈতিক অবস্থান এবং উপনিবেশ-বিরোধী ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, অন্যদিকে চীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে একটি বিকল্প ক্ষমতাকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে এশীয় রাজনীতিতে নেতৃত্বের প্রশ্নটি একটি আদর্শগত প্রতিযোগিতার রূপ ধারণ করে (Acharya, 2014)।

চীনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ভারত যদি চীনের তুলনায় অধিক ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী এবং নেতৃত্বের অধিকারী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা চীনের আঞ্চলিক ও কৌশলগত অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এই কারণেই চীনের রাজনৈতিক ধারণায় ভারতকে এমন একটি অবস্থানে পৌঁছাতে দেওয়া যাবে না, যেখানে সে এশীয় রাজনীতিতে চীনের সমকক্ষ বা তার ঊর্ধ্বে অবস্থান করতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় ভারত একটি বৃহৎ ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র। ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চলে ভারতের গভীর সাংস্কৃতিক সংযোগ ও প্রাধান্য বিদ্যমান, যার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার পরিসরে ভারতের প্রকৃত কোনো সমকক্ষ নেই। ইতিহাস ও ভূগোল—এই দুই বাস্তবতা চীনের পক্ষেও অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

এই প্রেক্ষাপটেই চীনের কৌশলগত চিন্তায় একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বা ব্যস্ত রাখা। এর ফলে ভারত বৃহত্তর এশীয় বা বৈশ্বিক নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে না। এই কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভারত–চীন সীমান্ত সংঘাতের পুনরাবৃত্ত ঘটনাবলি গভীরভাবে যুক্ত (Mohan, 2012)।

অতএব, সীমান্ত সংঘাতকে কেবল একটি ভূখণ্ডগত বিরোধ হিসেবে ব্যাখ্যা করলে বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বরং এই সংঘাতকে ভারত ও চীনের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতা, প্রভাব ও নেতৃত্বের ডিসকোর্সের অংশ হিসেবে বোঝা প্রয়োজন। ইতিহাস ও ভূগোল এখানে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি এশীয় রাজনীতিতে নেতৃত্বের প্রশ্নও এই সংঘাতের অন্তর্নিহিত কারণ হিসেবে কাজ করে। এর সাথে যে ধারণাগুলো জড়িয়ে রয়েছে—

চীন দীর্ঘদিন ধরে মনে করে যে সামরিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতায় তারা ভারতের তুলনায় এগিয়ে; তাই সীমান্তে **"সালামি ট্যাকটিকস"** অর্থাৎ ধাপে ধাপে ছোট ছোট এলাকা দখল বা বাস্তব নিয়ন্ত্রণের রেখা পরিবর্তনের কৌশল প্রয়োগ করে কৌশলগত চাপ সৃষ্টি করে। এই নীতির লক্ষ্য শুধু সীমান্ত সুবিধা অর্জন নয়, বরং ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ায় সীমিত রাখা এবং বৃহত্তর এশীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তার উত্থানকে নিয়ন্ত্রণ করা। ১৯৬২-পরবর্তী সময় থেকে ডোকলাম (২০১৭) ও লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় সামরিক সংঘর্ষ এই ধারাবাহিকতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এখান থেকেই containment বা competition শুরু হচ্ছে। যার মধ্যেও এক ধরনের ধারাবাহিকতা আছে। কারণ দুটি রাষ্ট্রের নেতৃত্বের জন্য জন্ম লগ্ন থেকেই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার সাথে নতুন একটা dynamics যুক্ত হয়েছে যে দুটি উদয়মান অর্থনীতি, বিশাল জনসংখ্যা, তাই চাহিদা প্রচুর, অর্থনৈতিকভাবে গতিশীল ফলে দুটি রাষ্ট্রের সম্পদ এবং বাজার অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিযোগিতা তৈরি হচ্ছে। তাই "Rising China" গল্পটি ক্রমশ Emerging India-র একটি উপগল্পের সাথে যুক্ত হচ্ছে (Majumdar, 2025)। যার জন্য কৌশলগত প্রতিযোগিতার পরিসর বেড়ে চলেছে।যা কেবলমাত্র সীমান্ত বিবাদে আবদ্ধ নেই। দক্ষিণ এশিয়া যে সমস্ত রাষ্ট্রের সাথে স্থল বা সামুদ্রিক সীমান্ত রয়েছে

তারা ভারতের তাৎক্ষণিক প্রতিবেশ, ভারতের সম্প্রসারিত প্রতিবেশ (extended neverhoot) ছাড়িয়ে প্রতিযোগিতা আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার পৌঁছেছে। উভয়ের মধ্যে নেতৃত্ব, মূল্যবোধ ছড়ানো ও সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতাচলবে।ভারত যেহেতু দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যমণি তাই চীন ভূ-রাজনৈতিকভাবে ঘিরে ফেলার (containment) চেষ্টা চালাচ্ছে। যদিও ভারতের ভৌগলিকগতভাবে সুবিধা রয়েছে (Roy-Chaudhary, 2018)।

চীন অর্থনৈতিক কারণে এশিয়াতে বিস্তার করছে। গতিশীল অর্থনীতি হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে সংযুক্ত হতে চাইছে। তাই তাদের যে অংশগুলো ভূখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ (Xinjiang, Yunnan), সেই জায়গাগুলি থেকে একটা সমুদ্রপথ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাই চীনের ভূকৌশলগত "ল্যান্ড-স্কিপিং" (Land-Skipping) কৌশল দক্ষিণ এশিয়া করে চলেছে। চীনের যে belt and root initiative (BRI) এবং sting of pulse যা গতানুগতিকভাবে চলে আসছে। বাংলায় একটা প্রচলিত প্রবাদ "এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি মারা" অর্থাৎ ভারতকে কিছুটা চাপে রাখা, বাজার সম্পদের প্রাপ্তি, সমুদ্র পথের প্রয়োজন মেটানো। এই উদ্দেশ্য গুলি নিয়ে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে জোরদার করে চলেছে। এই আখ্যান এর সাথে ২০১৩ সাল থেকে রাজনৈতিক "ল্যান্ড-স্কিপিং"এর কাজটা করে চলেছে যা বর্তমানে আরেকটা স্তরে পৌঁছেছে। 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিসিয়েটিভ' শিজিংপিংয়ের মস্তিষ্ক প্রসূত। তিনি চীনের পূর্বতন সম্পর্কের জালক প্রক্রিয়াকে আরও একটা স্তরে নিয়ে গেছেন।

ভারতের প্রত্যুত্তরী ভূকৌশলগত "ল্যান্ড-স্কিপিং" করারও চেষ্টা করেছে। এখানেও পরিবর্তন রয়েছে।দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়তে নানান ধরনের যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ করেছে এবং রাজনৈতিকভাবে নিজের উপস্থিতি তুলে ধরেছে। ASEAN Plus মেকানিজম ও ASEAN-India Summit: 'Act East Policy'-এর মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সংযোগ জোরদার (Mohan 2015)। East Asia Summit: বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক নিরাপত্তা কাঠামোতে অংশগ্রহণ। Quadrilateral Security Dialogue (Quad): যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সমন্বয়— চীনা প্রভাবের ভারসাম্য রক্ষা (Pant, 2019)। ফলের এগুলির দ্বারা ভারত-চীন ল্যান্ড-স্কিপিং একটা স্তরে পৌঁছেছে। মনে রাখা দরকার চীনের BRI কে "Proactive" কৌশল হিসেবে ব্যাখ্যা চলেছে। এখানে অন্যান্য দেশ চীনের কাছে আসছে না। চীন বলছে তাদের সাথে আছে, পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরও উন্নয়ন হবে, চীনেরও উন্নয়ন ঘটবে। কোথাও কিন্তু চীন বলছে না ভারতকে ঘিরে রাখার জন্য করছে। BRI কে একটা ইতিবাচক হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এখানে চীনের গতানুগতিক ধারণার একটা পরিবর্তন দেখছি। চীনারা গতানুগতিকভাবে এই অঞ্চলে ভারতকে নিয়ন্ত্রণে বা চাপে রাখার জন্য ভূ-খণ্ডগত সংঘাত কে মাঝে মাঝে উসকে দিচ্ছে, সামরিকভাবে। এর সাথে ভারতকে চারদিক থেকে কৌশলগত অর্থনৈতিক একটা বেষ্টনীর মধ্যে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। যদিও পাল্টা ল্যান্ডস্কেপিং ভারতও করছে কিন্তু তা কূটনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে। কিন্তু পরিবর্তনটা এসেছে যে -প্রতিযোগিতা এখন সামুদ্রিক এলাকায় পৌঁছেছে। যার ফলে একটা নতুন দিক এসেছে যার নাম ইন্দোপ্যাসিফিক এবং ভারত এই ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। কেউ কেউ খেলোয়াড় হিসেবেও দেখেছে। এই ব্যবস্থা একটি অংশ যার নাম Quadrilateral Security Dialogue (Quad)। ভারত এখানে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইন্দোপেসিফিক ও BRI এর মধ্যে একটা ক্রিটিকাল ফ্যাক্টর কারণ ভারতে একমাত্র রাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ার যে এই BRI প্রজেক্ট টিকে আটকে রেখেছে। যার ফলে চীনের কৌশলগত ল্যান্ডস্কেপিং সম্পূর্ণ হচ্ছে না। অপরদিকে ভারত একটা পাল্টা ল্যান্ড স্কিপিং এর শরিক যার একটা বড় দিক সামুদ্রিক অঞ্চল যার মধ্যে আবার ভারত মহাসাগরও রয়েছে। সেজন্যে ভারতকে চীন গুরুত্বের চোখে দেখতে বাধ্য। যার ফলে BRI যেমন অসম্পূর্ণ ঠিক একইভাবে ইন্দোপ্যাসিফিক ব্যবস্থায় ভারত যদি সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ না করে তাহলে সেখানেও একই অবস্থা তৈরি হবে।

চীন একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ (১৯৬৪) হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারত পারমাণবিক মহলে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপ্ত ছিল। ভারত ও বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে ১৯৯৮ সালে পারমাণবিক শক্তিধর হিসাবে নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। "ভারত মার্কিন অসামরিক পারমাণবিক চুক্তি" বা '১২৩ চুক্তির' পর আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (NSG) তে প্রবেশের পথ সরল হয়েছে। চীন কিন্তু বারবার বাধা দিয়ে গেছে, পারমাণবিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চীন আর নিতে চায়নি। এছাড়াও ভারতের প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের সাথে চীনের দৃঢ় এবং স্থায়ী সম্পর্ক এবং সেই সূত্রে জঙ্গি গোষ্ঠী জইশ-ঈ মহাম্মদের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহার কে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করণে অনীহা ভারতের কপালে চিন্তা টেনে রেখেছিল (মন্ডল, ২০২৪)। যদিও

২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করা গেছে। এইরকম চীনের নানান ভারতকে চাপে রাখার জায়গা রয়েছে। কিন্তু চীনের মধ্যে এটাও কাজ করে যে ভারতকে প্রতিনিয়ত যদি চাপে রাখি তাহলে ভারত চীন সম্পর্কে যে জায়গা তা তৈরি হবে না। তাই সেটা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই containment ও competition চলতেই থাকবে। উল্লেখ্য শত সংকট সত্বেও ভারত চীন বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রয়েছে।

চীনের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী দ্বন্দ্ব বা দোলাচল বিদ্যমান। একদিকে ভারতের সাথে গঠনমূলক সম্পৃক্ততা অর্থাৎ সংলাপ, সহযোগিতা, পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে উন্নয়নের পথ রয়েছে। অন্যদিকে চাপ সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করে ভারতের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা অর্থাৎ উহান শীর্ষ সম্মেলন (২০১৮), চেন্নাইয়ের মামল্লাপুরমে (২০১৯) উভয় দেশের রাষ্ট্র নেতাকে মিলিত হতে দেখা গেছে তা সত্ত্বেও সীমান্তে দ্বন্দ্ব চলেছে।

চীন গালওয়ান (২০২০) পরবর্তীকালে আরো বেশি করে বাধ্য হয়েছে ভারতের যে ভূকৌশল গত মূল্য রয়েছে তা চীনের অস্বীকার করার জায়গা নেই।তাই তারা ভারতের সাথে সম্পর্ক বারবার সরল করার চেষ্টা করছে। এখান থেকেই সহযোগিতার জায়গায় পৌঁছাচ্ছে। চিনাচিন্তকদের মনে ইন্দো-প্যাসিফিকে ভারতকে নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। কারণ এ হলো নতুন ভারত যারা লাদাখের গালওয়ানে চীনের সাথে মোকাবিলা করে, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের নৌ শক্তির উপস্থিতি, উভয় দেশ যেহেতু সামরিক ভাবে শক্তিশালী ২০২২ সালে স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর তথ্য অনুসারে সামরিক খাতে ব্যয় করেছে চীন (২৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং ভারত (৮১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) যদিও পৃথিবীতে সামরিক ব্যয় এর দিক থেকে চীন দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ২০২৩ সালে অনুসারে চীনের পারমাণবিক অস্ত্রগারে ৪১০ টি ওয়ার হেড ও ভারতের ১৬৮ টি ওয়ারহেড রয়েছে। তাছাড়া ভারত কেবল তার সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করেনি বরং বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারকও হয়ে উঠেছে (Basu and Arshed, 2024)। উভয় দেশের সামরিক সক্ষমতা পারস্পরিক সংঘাতের সম্ভাবনা কমিয়ে সহযোগিতার পথে পরিচালিত করেছে।

আন্তর্জাতিক জলবায়ু ও বাণিজ্য আলোচনায় ভারত ও চীনের মধ্যে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। COP26-এ পশ্চিমা উন্নত দেশগুলি কয়লার ব্যবহার দ্রুত বন্ধ করার আহ্বান জানালেও ভারত ও চীন যুক্তি দেয় যে ধাপে ধাপে কয়লার ব্যবহার কমানোই বাস্তবসম্মত। ফলে চূড়ান্ত ঘোষণায় “phase out” এর পরিবর্তে “phase down” শব্দবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়, যা উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থ রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ (UNFCCC 2021)। একইভাবে World Trade Organization-এর কৃষি আলোচনায় ভারত ও চীন কৃষিনির্ভর উন্নয়নশীল অর্থনীতির স্বার্থে খাদ্য নিরাপত্তা, ন্যূনতম সহায়তা মূল্য এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের সুরক্ষার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। উন্নত দেশগুলির উচ্চ কৃষি ভর্তুকি বৈশ্বিক বাজার বিকৃত করলেও উন্নয়নশীল দেশগুলির সহায়তা সীমিত—এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেই তারা G-33 গোষ্ঠীর মাধ্যমে যৌথভাবে দরকষাকষি করে (WTO 2015)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১৪ সালে পঞ্চশীল নীতির ৬০তম বার্ষিকী উপলক্ষে চীনের রাষ্ট্রপতি Xi Jinping উল্লেখ করেন যে পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতি—পারস্পরিক সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান, আক্রমণ না করা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, সমতা ও পারস্পরিক সুবিধা, এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—একবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার ভিত্তি হতে পারে। তিনি জোর দেন যে ভারত ও চীনের মতো উদীয়মান শক্তিগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এশিয়ায় স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য (Mohan, 2015)। এছাড়াও BRICS এর মধ্য দিয়ে ভারত ও চীন তাদের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একাকীকরণকে আরো গভীর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে যেমন স্থানীয় মুদ্রা ব্যবহার করে আন্তঃ ব্রিকস বাণিজ্য পরিচালনার জন্য সাম্প্রতিক চুক্তি এবং ব্রিকস নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক(NBA) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যা ২০১৪ সালে ব্রিকস রাষ্ট্রগুলোর মাধ্যমে গঠিত হয়। সাম্প্রতিক কালে ভারত চীনের নেতৃত্বাধীন এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেসমেন্ট ব্যাংক (AIIB) যা বিশ্ব অর্থনৈতিক সংস্থার (IMF) বিকল্প হতে পারে। চীনের (অংশ ২৬ শতাংশ)পর দ্বিতীয় বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডার ভারত(৭.৫) শতাংশ। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত থাকে ভারত ও চীন। তারা যুক্তি দেয় যে সংঘাত সমাধানের পথ হলো সংলাপ ও কূটনীতি, একতরফা নিন্দা নয়। ভারত তার

জ্বালানি নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা নির্ভরতা এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের কথা তুলে ধরে (Pant & Joshi 2022), অন্যদিকে চীন ন্যাটো সম্প্রসারণ, নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং সার্বভৌমত্বের জটিলতা উল্লেখ করে নিরপেক্ষ অবস্থান ব্যাখ্যা করে (Wang 2022)। উভয় দেশই নিষেধাজ্ঞা ও ব্লক রাজনীতির বিরোধিতা করে এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানায়, যা তাদের বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (UNGA 2022)।

ভারত ও চীন এশিয়ার দুই বৃহত্তম অর্থনীতি। ২০২৫ সাল অনুসারে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি (প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলার) যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার) পরেই। অপরদিকে ভারত চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি (প্রায় ৪.৫১ ট্রিলিয়ন, ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতি হতে আগ্রহী) তৃতীয় বৃহত্তম স্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে (Majumdar, 2025)। উভয় দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

চীনা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন যে ২০২৫ এর আগস্ট মাসে রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিয়ানজিনে একটি সফল বৈঠক মধ্য দিয়ে চীন-ভারত সম্পর্ককে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ২০২৫ সালে, চীন ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১৫৫.৬ বিলিয়ন ডলার সর্বোচ্চ রেকর্ড করেছে। যা বছরে ১২ শতাংশেরও বেশি রেকর্ড হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতার বিশাল সম্ভাবনার প্রতিফলন।রাষ্ট্রদূত বলেন, চীনের আত্মনির্ভরতার উপর জোর, ভারতের আত্মনির্ভর ভারত কৌশলের সাথে মিলে যায়। চীনের 'মহান সম্প্রীতির বিশ্ব' (world of great harmony)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও ভারতের 'বসুধৈব কুটুম্বকম' (the world is one family) সাধনার প্রতিধ্বনি করে।চীন এবং ভারত এক মহান সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশীদার তাই তাদের একে অপরের সহযোগিতার দিনে দিনে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

1. Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977).Power and interdependence : World politics in transition. Little, Brown and Company.
2. Kaplan, R. D. (2012). The revenge of geography: What the map tells us about coming conflicts and the battle against fate. Random House.
3. Mandal, B. (2024). Covid-19 o Bharat-Chin samparker notun samikaran. Samaj Jijnasa, 17.
4. Lamb, A. (1964). The China–India border. Oxford University Press.
5. Acharya, A. (2007). The emerging regional architecture of world politics. Polity.
6. Acharya, A. (2014). The end of American world order. Polity.
7. Mohan, C. R. (2012). Samudra Manthan: Sino-Indian rivalry in the Indo-Pacific. Carnegie Endowment for International Peace.
8. Majumdar, J. A. (2025). India's foreign policy: Past patterns and present trends. PHI Learning Private Limited.
9. Mohan, C. R. (2015). Modi's world: Expanding India's sphere of influence. HarperCollins India.
10. Pant, H. V. (2019). The Quad and the free and open Indo-Pacific. Observer Research Foundation.

11. United Nations Framework Convention on Climate Change. (2021). Glasgow climate pact (Decision 1/CP.26). UN Climate Change Conference COP26, Glasgow. https://unfccc.int/documents/460950

12. World Trade Organization. (2015). Ministerial decision on public stockholding for food security purposes (WT/MIN(15)/44; WT/L/979). Nairobi Ministerial Conference.https://docs.wto.org/

13. Ministry of External Affairs, Government of India. (2014). Joint commemoration of the 60th anniversary of the Panchsheel principles. Government of India. https://mea.gov.in/

14. Pant, H. V., & Joshi, Y. (2022). India's response to the Russia–Ukraine war and the limits of strategic autonomy. Observer Research Foundation Issue Brief.

15. Roy-Chaudhury, R. (2018). India's perspective towards China in their shared South Asian neighbourhood: Cooperation versus competition. Contemporary Politics, 24(1), 98–112.

16. Ghosh, A. (2018). Arab biplab-uttar natun biswa: Bharater samasya o Samhadana.

17. Haque, A. (2023). Antarjatik samparka: Tattva o samasamayik bishva [আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: তত্ত্ব ও সমসাময়িক বিশ্ব]. Suhrid Publication.

18. Bhattacharya, P., & Majumdar, A. J. (Eds.). (2022). Antarjatik somparker ruparekha (Vol. 1). Setu Prakashani.

19. Malone, D. M., & Mukherjee, R. (2010). India and China: Conflict and cooperation. Survival, 52(1), 137–158. https://doi.org/10.1080/00396331003612513

Citation: **প্রামানিক. স.,** (2025) "একবিংশ শতাব্দীতে ভারত-চীন সম্পর্কের গতিশীলতা : ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনশীলতা এবং দ্বন্দ্ব", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-05, May-2025.